মুজিব থেকে মওলানা...মুক্তিযুদ্ধে ওপার বাংলা

সৌমিত্র দস্তিদার

চুয়ান্ন বছর হয়ে গেল। দেখতে দেখতে সময় যেন ঝড়ের মতো চলে যায়। পাকিস্তান ভেঙে নতুন রাষ্ট্র বাংলাদেশের জন্ম, কখনও কখনও মনে হয় যেন এক আশ্চর্য রূপকথা। লক্ষ লক্ষ প্রাণ চলে গেছে। হাজার হাজার পরিবার রাতারাতি সব হারিয়ে পথের ভিখারি হতে বাধ্য হয়েছেন। শ'য়ে শ'য়ে মহিলাদের ধর্ষণ করা হয়েছে। তবুও একদিন সমস্ত অন্ধকার পার হয়ে বাংলার পুব প্রান্তে নতুন সূর্য উঠল। স্বাধীন জনপদের নাম হল বাংলাদেশ। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী সংসদে ঘোষণা করলেন, পাকিস্তান সেনাবাহিনী ভারতীয় সেনার কাছে পর্যুদস্ত হয়ে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়েছে। আজ থেকে ঢাকা এক স্বাধীন দেশের স্বাধীন রাজধানী। পড়শি জনপদের অগ্নিগর্ভ দিনগুলো আমাদের দেশ, দেশের জনমনকে অশান্ত করে তুলেছিল। হাজার হাজার শরণার্থী সেদিন আশ্রয় নিতে ছুটে এসেছিলেন ভারতের মাটিতে। শুধু পশ্চিমবঙ্গ নয়, আসাম, ত্রিপুরা, মেঘালয় সব জায়গায় দলে দলে লোক ছুটে এসেছিলেন। ভারতের মানুষ তাদের বুকে জড়িয়ে ধরে আশ্রয় দিয়েছিলেন। ভারতের মাটিতেই একের পর এক ট্রেনিং ক্যাম্পে মুক্তিযুদ্ধের অস্ত্র শিক্ষা নিতেন ওপারের তরুণেরা। কলকাতায় ছিল বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকারের সদর। কেয়ারটেকার ওই সরকারের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন আওয়ামী লীগ নেতা তাজউদ্দীন আহমেদ।

অত বড় যুদ্ধ, অত রক্তপাত, ইদানীং মনে হয় সেভাবে আমরা মনে রাখিনি। যেটুকু যা চর্চা তা স্রেফ নির্দিষ্ট দু' একটা দিনে রুটিন মেনে। আনুষ্ঠানিকতায় আড়ম্বর থাকে, মনের আবেগ থাকে না। পশ্চিমবঙ্গেও অধিকাংশ বাঙালিদের কাছেও যেন ভিয়েতনাম বা নিকারাগুয়া যত আলোচিত, তার ধারেকাছে, হালে চায়ের কাপেও তুফান তোলে না চুয়ান্ন বছর আগের মুক্তিযুদ্ধ। যা সবদিক দিয়েই ছিল আক্ষরিক অর্থেই জনযুদ্ধ। সাধারণভাবে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের এক চেনা বয়ান আছে। তা হল, ১৯৭০ সালে সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ পাকিস্তানের দু'খণ্ড মিলিয়ে যে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছিল, তাতে শেখ মুজিবুর রহমানের দেশের কুর্সিতে বসা ছিল স্বাভাবিক। শেখ সাহেবের দল পূর্ববঙ্গে একচেটিয়া আসন পেয়েছিলেন। অন্যদিকে পশ্চিম পাকিস্তানে জুলফিকার আলি ভুট্টোর পিপলস কনফারেন্স গরিষ্ঠতা পেলেও দুই অংশ মিলে শেখ মুজিবুর রহমানের পাল্লাই ছিল ভারি। কিন্তু বঙ্গবন্ধুর ন্যায্য দাবিকে নস্যাৎ করে পাকিস্তানের জেনারেল ইয়াহিয়া খান একতরফাভাবে পূর্ব বাংলার মানুষের ওপর নামিয়ে আনলেন দমন পীড়নের স্বৈরতান্ত্রিক পথ। ১৯৭১ সালের পঁচিশে মার্চ মিলিটারি ক্র্যাকডাউন হল ঢাকার রাস্তায়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেপ্তার করা হল তাঁর ধানমণ্ডির বাসা থেকে। আওয়ামী লীগের অধিকাংশ নেতা ও বিরাট সংখ্যক কর্মী, সমর্থকরা দলে দলে সীমান্ত পার হয়ে

ভারতে চলে এসে অস্থায়ী সরকার গঠন করলেন। ভারত সরকারের মদতে তৈরি হল মুক্তিবাহিনী। শেষ অবধি পাকিস্তান সেনাবাহিনী ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলে, পাল্টা আক্রমণ করল এদেশের ফৌজ। শেষ অবধি পাকিস্তানের বিশাল বাহিনী, আগেই বলেছি যে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর ভারত ও মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে হার মানতে বাধ্য হল। জেনারেল ওসমানী ছিলেন মুক্তিবাহিনীর প্রধান। অথচ কোনও এক অদৃশ্য কারণে যুদ্ধজয়ের পরম মুহূর্তে ভারত পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর পাশাপাশি ওসমানীর অস্তিত্ব মুছে গেল। ঘটনাচক্রে মনে হল পাকিস্তানের ফৌজ ভারতের সেনাবাহিনীর কাছে পরাজিত হয়েছে। দু'দেশের যুদ্ধে আকস্মিকভাবে যেন ছোট হয়ে গেল মুক্তিযুদ্ধের গরিমা। মুক্তিসংগ্রামের ত্যাগ, বীরত্ব, লড়াই, সংগ্রাম একটু হলেও আড়ালে চলে গেল ভারতীয় সেনাবাহিনীর বিপুল ঢক্কানিনাদে। অথচ সত্যি এটাই যে ওপার বাংলার জনসাধারণের মরণপণ লড়াই ছাড়া পূর্ব বাংলা স্বাধীনতা পেত না। হতে পারে লড়াই হত আরও দীর্ঘস্থায়ী। ক্ষয়ক্ষতি, বিপর্যয়, প্রাণহানি অনেক ব্যাপক হত, ভারত সরাসরি যুদ্ধে জড়িয়ে না পড়লে। সবই হয়ত ঠিক। কিন্তু যুদ্ধ জয়ের মূল কৃতিত্ব নিঃসন্দেহে ওপারের জনতার।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতের অবদান যথেষ্ট। তারা শুধু মিলিটারি ট্রেনিংই দেয়নি। নিজেদের মাটি ছেড়ে দিয়েছিল অস্থায়ী সরকারের জন্য। স্বাধীন বেতার কেন্দ্র থেকে যাবতীয় পাকিস্তান বিরোধী প্রচারের উৎস ছিল কলকাতা। কিন্তু পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীর অত্যাচারের বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছিল সারা দেশ। এদেশের বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব থেকে সাধারণ জনতা, প্রত্যেকের সমর্থন ছিল মুক্তিযোদ্ধাদের ওপর। কখনও কখনও বিষয়টিকে এমন ভাবে দেখা হয়, যেন লড়াইটা ছিল ভারত সরকারের প্রত্যক্ষ মদতে একমাত্র আওয়ামী লীগের। বস্তুত বিষয়টি এইরকম একমাত্রিক মোটেও নয়। মুক্তিযুদ্ধ আদতে ছিল জনযুদ্ধ। যেটা তুলনায় অনেক কম বলা হয়, সেটাই কিন্তু ছিল যুদ্ধজয়ের মুখ্য চাবিকাঠি। সারা পূর্ব বাংলা সেদিন ছিল যুদ্ধক্ষেত্র। নিঃস্ব চাষী সাধ্যমত গেরিলা যুদ্ধ করে গেছে প্রতিপক্ষের অসীম শক্তিধর অত্যাধুনিক বাহিনীর সঙ্গে। জলে জঙ্গলে বিপুল বীরত্ব দেখিয়ে বাংলার জেলে, মাঝি মাল্লারা হানাদার রুখেছে। বাংলার নারীদের অদম্য সাহসী ভূমিকা তুলনায় কম উচ্চারিত হয়, কোনও এক অজ্ঞাত কারণে। যেমন বলাই হয় না মুক্তিযুদ্ধে বামপন্থী কমিউনিস্টদের অনন্যসাধারণ সংগ্রামের কথা। দেশের একাধিক জায়গায় ঘাঁটি তৈরি করে গেরিলা যুদ্ধ চালিয়ে গেছেন বাম কর্মী সমর্থকরা। ঢাকার অদূরে শিবপুর, নরসিংদী নিয়েই হতে পারে এক চমৎকার চলচ্চিত্র, অথবা ধ্রুপদী উপন্যাস। বামেদের কৃতিত্ব এটাই যে সাধারণভাবে তাঁরা কখনও ভারত সরকারের সহায়তা পাননি। বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আওয়ামী লীগ ছাড়া কাউকে ট্রেনিং বা অন্যান্য সুবিধে দেওয়া হবে না এই যুক্তিতে তাঁদের পদে পদে হেনস্থা করা হয়েছে।

চুয়ান্ন বছর পরেও বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সঠিক মূল্যায়ন হয়নি। যথার্থ গবেষণা ছাড়া এই মূল্যায়ন করা সম্ভব নয়। একপাক্ষিক গুণকীর্তন কখনও নির্মোহ ইতিহাস নির্মাণ করতে পারে না। বাংলাদেশের যুদ্ধ ছিল বহুমাত্রিক। কত যে তার ভেতরের আখ্যান তা বুঝিয়ে বলাও শক্ত। সময় করে তারেক মাসুদের 'নরসুন্দর' ছবিটি দেখলে বুঝতে পারবেন কী বলতে চাইছি। সাধারণত অবাঙালি লোকজন ছিল পাকিস্তানের পক্ষে। অথচ বেশ কিছু ক্ষেত্রে তারা মুক্তি বাহিনী বা তাদের সমর্থকদের প্রয়োজনে পাশে দাঁড়িয়েছেন। বালুচ সৈন্য তুলনায় কখনও সখনও মুক্তি যোদ্ধাদের সঙ্গে নরম ব্যবহার করেছে এমন ঘটনাও ঘটেছে। সামনে ঈদ, মায়ের জন্য মন খারাপ বলে নিষ্ঠুর ব্রিগেডিয়ার বন্দি মুক্তিযোদ্ধাকে পালিয়ে যেতে দিয়েছেন, এমন দৃষ্টান্ত কম নয়। গ্রামে গ্রামে যে গেরিলা যুদ্ধ, সেখানে নাহয় কিছুটা প্রাকৃতিক সুবিধা ছিল। গ্রামের জীবন, পরিবেশ চেনা না থাকায় পাকিস্তান সেনাবাহিনী অনেক ক্ষেত্রে পর্যুদস্ত হয়েছে। বিশেষ করে নদীমাতৃক অঞ্চলে। কিন্তু শহরের যে গেরিলা লড়াই তা কখনও দানা বাঁধতেই পারে না, স্থানীয় জনগণের সহায়তা ছাড়া। শহীদ জননী জাহানারা ইমামের ছেলে

রুমী তো যুদ্ধের শেষ দিকে ঢাকায় অ্যাকশন করতে গিয়ে শত্রুর হাতে ধরা পড়ে নৃশংস অত্যাচারের মধ্য দিয়ে শহীদ হন। কিন্তু ধরা পড়ার আগে অবধি তো রুমী বাহিনী লড়াই চালিয়ে গেছেন। জনসমর্থন না থাকলে এটা হয় না।

পাকিস্তানের জন্মলগ্ন থেকেই, শাসকদের ঔপনিবেশিক মনোভাব নিয়ে ধীরে ধীরে বিক্ষুব্ধ হতে থাকে পূর্ব পাকিস্তান। ১৯৪৯ সালে মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে গড়ে ওঠে আওয়ামী মুসলিম লীগ। ভাসানী ছিলেন এক বর্ণময় চরিত্র। ১৮৮০ সালে জন্মেছিলেন সিরাজগঞ্জে। ছোটবেলায় বাবা মা ভাই বোন হারিয়ে অনাথ হয়ে পড়েন। এক সময় যোগাযোগ হয় ইরাকের পীর নাসিরউদ্দিন বোগদাদীর সঙ্গে। তাঁর হাত ধরেই গেলেন আসামের জলেশ্বরে। সেখান থেকে পড়াশোনা করতে ভর্তি হলেন দুনিয়া খ্যাত দেওবন্দে। দেওবন্দ ছিল স্বাধীনতাকামী আলেমদের গড়। ভাসানী পড়া শেষ না করেই দেশে ফিরলেন অবিভক্ত ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধে যোগ দিতে। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের রাজনীতিতে আকৃষ্ট হয়ে সারা জীবন অসাম্প্রদায়িক থেকে গেলেন। আসামের সামন্তবাদের বিরুদ্ধে গড়ে তুললেন কৃষক আন্দোলন। ভাসান চরের বাসিন্দা ছিলেন বলে লোকমুখে হয়ে উঠলেন মওলানা ভাসানী। মওলানা কোনও ধর্মীয় উপাধি নয়, ভাসান চরের মুরুব্বি বলে স্থানীয় মানুষের কাছে তিনি মওলানা, জ্ঞানী ব্যক্তি। ভাসানীর রাজনীতি ছিল কৃষক ও মজুরের স্বার্থে। সারা জীবন তাঁর শ্রেণিমিত্র ছিল জেলে, মাঝি, কুমোর, কামার, তাঁতী, ডোম, অসংগঠিত মজুর ও কৃষক। ধীরে ধীরে গরিবের সংগ্রামের অংশীদার ছিলেন বলে হয়ে উঠলেন মজলুম জননেতা। ১৯৪৭ সালে দেশভাগের সময়ে ভাসানী ছিলেন আসামের জেলে বন্দি। ছাড়া পাবার পর ভারত সরকার তাঁকে জোর করে সীমান্ত পার করে পাকিস্তান পাঠিয়ে দিলেন। তিনি তাঁর পুরনো চেনা জায়গা টাঙ্গাইলের সন্তোষে এসে পাকাপাকিভাবে থিতু হলেন। ততদিনে পূর্ব পাকিস্তানের যুবমনে শাসকদের নীতি নিয়ে প্রশ্ন উঠে গেছে। শেখ মুজিবুর রহমান, আলি আহাদ, মহম্মদ তোয়াহা এইরকম বেশ কয়েকজন যুবকর্মী নিজেদের মধ্যে আলাপ আলোচনা করছেন ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে। মওলানা ভাসানী এসে ওই তরুণদের নিয়ে নতুন দল গড়লেন। জনতার মুসলিম লীগ সরকারি মুসলিম লীগের পথে না চলে জনতার স্বার্থে চলবে এই অঙ্গীকার নিয়ে জন্ম নিল আওয়ামী মুসলিম লীগ। শেখ মুজিবুর রহমান হলেন দলের অন্যতম সহ সম্পাদক। সভাপতি মওলানা ভাসানী। ভাসানী ছিলেন আপোষহীন যোদ্ধা। জনতার নয়নমণি। গরিব হিন্দু মুসলমানের আপনজন। ভয়ডরহীন ভাসানী বক্তৃতা করতেন ঘন্টার পর ঘণ্টা। অত্যন্ত উত্তেজক ভাষায়। তাঁর লড়াইয়ে সবথেকে বিশ্বস্ত যোদ্ধা ছিলেন তরুণ শেখ মুজিবুর রহমান। গোপালগঞ্জের এই তরুণের রাজনৈতিক দীক্ষা কলকাতার ইসলামিয়া কলেজে ছাত্র রাজনীতি করতে গিয়ে। শেখ সাহেব ছিলেন মুসলিম লীগের জনপ্রিয় ছাত্র নেতা। সোহরাওয়ার্দীর ভাবশিষ্য। শেখ মুজিবুর রহমান অসম্ভব দক্ষ সংগঠক তো বটেই, সেই সঙ্গে ছিলেন বাগ্মী। সাহসী। এবং উদারচেতা। মূলত ভাসানী ও মুজিবুর রহমানের চেষ্টায় আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রভাব বাংলা ভূখণ্ডে বাড়তে লাগল। চুয়ান্ন সালে দেশে সাধারণ নির্বাচনে ভাসানী, সোহরাওয়ার্দী, শের-ই-বাংলা ফজলুল হক জোট বেঁধে যুক্ত ফ্রন্ট গড়ে সাবেক, পাকিস্তান পন্থী মুসলিম লীগকে পর্যুদস্ত করে ক্ষমতা দখল করল। কিন্তু পাক শাসকেরা ষড়যন্ত্র করে যুক্তফ্রন্ট ভেঙে দিল। তার আগে বাহান্ন সালে ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে বাঙালি জাতি সত্তা জনমনে ছাপ ফেলতে শুরু করেছে। যুক্তফ্রন্ট ফেলে দেওয়ার ষড়যন্ত্র পাক সরকারের প্রতি আরও বিক্ষুব্ধ করে তুলতে লাগল জনসাধারণের বড় অংশকে। মওলানা ভাসানী তখন মজলুম জনতার মুকুটহীন সম্রাট। জনগণের নেতা হিসেবে দ্রুত উঠে আসছেন শেখ মুজিবুর রহমান। সোহরাওয়ার্দী সাহেবের স্নেহধন্য মুজিবুর ভাসানীর কাছেও আপনজন। তবুও পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসন এবং মার্কিন যুদ্ধ জোটে পাকিস্তানের সামিল হবার প্রশ্নে দ্বন্দ্ব বাধল সোহরাওয়ার্দী ও ভাসানী শিবিরের। ভাসানী কোনও অবস্থাতেই জোট নিরপেক্ষ নীতির বদলে মার্কিন আনুগত্য মানতে রাজি নন। তাছাড়া

তিনি চান পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন। অপরদিকে সোহরাওয়ার্দী মনে করেন পাকিস্তান ইতিমধ্যেই পূর্ব বাংলাকে যথেষ্ট স্বায়ত্তশাসন দিয়ে দিয়েছে। কাগমারীতে আওয়ামী লীগ ভাঙতে চলেছে এমন আভাস পাওয়া গেল। তার আগে ভাসানী মওলানার জোরাজুরিতে আওয়ামী লীগ থেকে মুসলিম শব্দটি বাদ দেওয়া হয়েছে, অন্যান্য ধর্মের লোকদের কাছে দলকে ধর্মনিরপেক্ষ করার তাগিদে। কাগমারী সম্মেলনে ভাসানী পাক শাসকদের সতর্ক করে দিলেন, আলেকুম সেলাম বলে। আসলে তিনি বললেন যে সময় হয়ে এসেছে পাকাপাকিভাবে তোমাদের থেকে আলাদা হবার। ওই কাগমারী সম্মেলনে সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়কে ভাসানী বলেছিলেন যে, পুব ভূখণ্ড চোদ্দ পনেরো বছর পর পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হবেই। ঠিক চোদ্দ বছর বাদেই পূর্ববঙ্গে উড়েছিল স্বাধীন পতাকা।

১৯৫৭ সালে আওয়ামী লীগ ভেঙে মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে গড়ে উঠল ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ)। পাকিস্তানের কিংবদন্তি জননায়ক সীমান্ত গান্ধী বাদশা খান স্বয়ং যোগ দিলেন ন্যাপে। দেশের বামপন্থী সব শক্তিই ন্যাপের পতাকার নিচে সংগঠিত হয়ে খুব দ্রুত ন্যাপকে এক শক্তিশালী দলে পরিণত করলেন। গ্রামে গ্রামে চাষী মজুরদের একজোট করতে লাগলেন মওলানা ভাসানী। ষাটের দশকে আয়ুব খানের শাসনকালে অগ্নিগর্ভ হতে লাগল পুব বাংলা। মিথ্যে মামলায় শেখ মুজিবুর রহমানকে জেলে দেওয়ায় পরিস্থিতি ক্রমে উত্তপ্ত হল। ওই সময় ছাত্র আন্দোলন তুঙ্গে। একদিকে ভাসানীপন্থী, চীন সমর্থক রাশেদ খান মেনন, হায়দার আকবর খান রনো, মুস্তাফা জামাল হায়দার, দীপা দত্তেরা, অন্যদিকে লীগপন্থী ছাত্রদের বড় দল মিলেমিশে আয়ুবশাহীর বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে লাগলেন। জেল থেকে মুক্তি পেয়ে মুজিবুর রহমান ছ'দফা দাবি সামনে নিয়ে এলেন। ভাসানীর সমাজতান্ত্রিক রাজনীতির ডাকের চেয়ে মধ্যবিত্ত মননে ছয় দফা জনপ্রিয় হয়ে উঠতে লাগল দ্রুত। পূর্ব বাংলার উদীয়মান শিল্পগোষ্ঠীর কাছেও পূর্ণাঙ্গ স্বায়ত্তশাসন বেশি গ্রহণযোগ্য হল। সত্তর সালে ঘোষিত নির্বাচন বয়কট করলেন মওলানা ভাসানী। শ্লোগান উঠল, ভোটের আগে ভাত চাই। পরিস্থিতি ক্রমশ তেতে উঠতে লাগল। এর মধ্যে নির্বাচনের আগে ভয়ঙ্কর প্রাকৃতিক বিপর্যয় ধ্বংস করে দিয়ে গেল দক্ষিণবঙ্গকে। ভাসানী খোলাখুলি ডাক দিলেন স্বাধীন পূর্ব বাংলার। ন্যাপ নির্বাচনে ওয়াক ওভার দেওয়ায় সুবিধা হয়ে গেল শেখ আওয়ামী লীগের। শোনা যায় ভোট বয়কটের সিদ্ধান্তের পিছনে ছিল মুজিবুর রহমানের প্রতি ভাসানীর অপত্যস্নেহ। ভাসানী জানতেন জনমনে এখন বঙ্গ জাতীয়তাবাদের জোয়ার আসন্ন, তার কাণ্ডারি হবার যোগ্যতা একমাত্র তখন মুজিবুর রহমানের। ন্যাপ পথের কাঁটা হয়ে আগামীর স্বাধীন ভূখণ্ডের আগমনবার্তা আটকাতে চায়নি। ভাসানী বলেছিলেন, মুজিবুর, তুমি পাকিস্তানের শাসক না হয়ে এই জনপদের স্বাধীন নেতা হও। শেখ মুজিবুর রহমান ততদিনে বঙ্গবন্ধু। সারা দেশে তাঁর আকাশছোঁয়া জনপ্রিয়তা। ৭ই মার্চ তিনি ঐতিহাসিক ভাষণে ডাক দিলেন, ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ার। বললেন, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।

তার পরের কাহিনি সবার মোটামুটি জানা। পঁচিশ মার্চ যাবতীয় আলাপ আলোচনা বরবাদ করে আওয়ামী লীগের হাতে পূর্ব বাংলার ক্ষমতা সমর্পণ না করে পাক মিলিটারি ঘৃণ্য আক্রোশে ঝাঁপিয়ে পড়ল নিরীহ দেশবাসীর ওপর। শুরু হয়ে গেল মুক্তিযুদ্ধ। আসলে যা ছিল জনযুদ্ধ, পিপল্‌স্ ওয়ার। যে যুদ্ধে অনেক আখ্যান, অনেক স্তর। অপরিসীম বীরত্ব, সাহস ও আত্মত্যাগ যেমন সত্যি, ঠিক তেমনি সত্যি তাজউদ্দীন আহমদের নেতৃত্বাধীন সরকারের মধ্যে আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব। আওয়ামী লীগের মধ্যেকার দুই গোষ্ঠীর কোন্দল। অনেক নেতার কলকাতা এসে আয়েসি জীবন যাপন নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন চলচ্চিত্র পরিচালক জাহির রায়হান স্বয়ং। এও ঠিক রক্তক্ষয়ী, মরণপণ লড়াই করে স্বাধীনতার গল্পের পাশে এসব নেতিবাচক ঘটনা নিতান্তই মামুলি। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস আজও পুরোপুরি সামনে আসেনি একথাও অস্বীকার করা যাবে না। এ ইতিহাস, আবারও বলব, একমাত্রিক নয়। তার পরতে পরতে যে বহু স্তর তাকে খুঁজে না পেলে মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিবৃত্ত অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। শেখ

মুজিবুর রহমান না থাকলে নিঃসন্দেহে এমন এক জাগরণ সম্ভব হত না। জেলে থাকলেও বঙ্গবন্ধু ছিলেন মূল নেতা। স্বাধীন বাংলার প্রধান কারিগর। সোহরাওয়ার্দী কোনোদিনই সে অর্থে পাকিস্তান ভেঙে নতুন জনপদের স্বপ্ন দেখেছিলেন বলে মনে হয় না। ফজলুল হকের জামানা তো আরও পুরনো। তবে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস থেকে মওলানা ভাসানীকে গৌণ বা পার্শ্ব চরিত্র করে দেওয়া বিসদৃশ। স্বাধীনতা বা মুক্তির যে আকাঙ্ক্ষা জনমনে জেগে উঠেছিল তার পুরোধা ছিলেন অবশ্যই মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী। মুক্তিযুদ্ধের সময় দেশের মধ্যে যে গেরিলা যুদ্ধ, তা সম্ভব হয়েছিল কৃষক মজুরের সম্মিলিত সক্রিয় ভুমিকায়। তাদের আজাদ বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন মজলুম জননেতা ভাসানীই। আগুন জ্বালানোর আগে সলতে পাকানোর কাজটি করেছিলেন মওলানা ভাসানীই। ইতিহাস যদি দাবি করে বাংলাদেশ জন্মগ্রহণ করেছিল, শুধুমাত্র ৭০-এর নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে, তাহলে তা পুরোপুরি একমাত্রিক। ইতিহাসের ভুল, সঙ্কীর্ণ ব্যাখ্যা। বস্তুত পাকিস্তান শাসকদের ঔপনিবেশিক আচরণের কারণে গড়ে ওঠা আওয়ামী লীগের জন্মসময়েই ইঙ্গিত ছিল পাকিস্তান বিভাজনের। ১৯৪৮ সালে টাঙ্গাইলের নির্বাচিত সাংসদ মওলানা ভাসানী বলেছিলেন, আমরা কি পাকিস্তানের গোলাম! ব্যাখ্যা দিয়ে বুঝিয়েছিলেন কোন ক্ষোভে তিনি এইরকম তিক্ত কথা বলতে বাধ্য হচ্ছেন। যে মুসলিম লীগ মুসলিম জনতার নয়নমণি ছিল, সেই লীগ, ১৯৫৪ সালে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। ফলে ধাপে ধাপে মুক্তিযুদ্ধের ভিত্তি নির্মিত হয়েছে। তার পিছনে শুধু আওয়ামী লীগ নয়, সর্বস্তরের জাতীয়তাবাদী চিন্তকদের ভুমিকা ছিল। উনসত্তরের গণ অভ্যুত্থান না হলে সত্তর হয় না। পাকিস্তানের মিলিটারি নায়ক আয়ুব খানের বিরুদ্ধে ভাসানীর নেতৃত্বে হাজার হাজার ছাত্র, যুব, কৃষক, শ্রমিক রাস্তায় নেমেছিল। ভাসানী হাট হরতালের ডাক দিলেন। বঙ্গবন্ধু তখন আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আসামি হয়ে জেলবন্দী। ভাসানী বললেন, বাস্তিল দুর্গ ভেঙ্গে যেভাবে ফরাসি বিপ্লবের জন্ম হয়েছিল, প্রয়োজন হলে আমরাও জেল ভেঙে মুজিবকে ছিনিয়ে আনব। পূর্ব বাংলা তখন আক্ষরিক অর্থেই অগ্নিগর্ভ। মিছিলে মিছিলে উত্তাল রাজপথ। পুলিশের গুলিতে শহীদ হলেন ছাত্র নেতা আসাদুজ্জামান। আসাদের মৃত্যু আগুন জ্বালিয়ে দিল সারা দেশে। মহিলাদের বিরাট মিছিলে হাজার হাজার ছাত্রী স্বতস্ফূর্তভাবে যোগ দিলেন। সামনের সারিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নেত্রী দীপা দত্ত ও স্নিগ্ধা চক্রবর্তী। আওয়াজ উঠল, আসাদের মন্ত্র জনগণতন্ত্র। বিক্ষোভ মিছিলে আতঙ্কিত আয়ুব শেখ মুজিবুর রহমানকে জেল থেকে বাধ্য হলেন মুক্তি দিতে। পরিস্থিতি বিবেচনা করে আয়ুব প্রস্তাব করলেন সর্বদলীয় গোলটেবিল বৈঠকের। নানা টালবাহানার পরে শেখ মুজিবুর রহমান যোগ দিলেন বৈঠকে। ভাসানী পন্থীরা শ্লোগান দিলেন — গোলটেবিল না রাজপথ! জবাবে জনতা বলল, রাজপথ রাজপথ...।

১৯৪৮, ৪৯, ৫২, ৫৪ সাল এক একটা মাইলফলক পূর্ববঙ্গের রাজনৈতিক ইতিহাসে। ষাটের দশক থেকে গণ আন্দোলন তীব্র হতে থাকে। দেশভাগ পরবর্তীতে যখনই আমরা দাঙ্গার ভয়াবহতা নিয়ে কথা বলি, তখনই আমাদের হয়ত চোখ এড়িয়ে যায়, যে পূর্ববঙ্গে যখনই গণ আন্দোলন তীব্র হয়েছে, তখনই পাকিস্তান সরকার হিন্দু মুসলিম দাঙ্গা বাধিয়ে সমস্যা থেকে পরিত্রাণ পেতে চেয়েছে। দাঙ্গা ছিল এক রাজনৈতিক অস্ত্র। রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস আলোচনায় না এনে বিষয়টিকে নিতান্তই ধর্মীয় বিভাজনের বিষবাষ্প বললে ইতিহাসের অর্ধেক সত্য বলা হয়। পুরোপুরি বিষয়টি স্পষ্ট হয় না। বস্তুত এই আধাখ্যাঁচড়া ব্যাখ্যার কারণেই আজও দুই বঙ্গের সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতির উন্নতি তো হয়ইনি, বরং দিনকে দিন খারাপ হচ্ছে। ফলে পূর্ববঙ্গের গণ আন্দোলনের চরিত্র বুঝতে হবে। শাসকদের সঙ্গে মূল দ্বন্দ্ব বোঝার দরকার রয়েছে। মূল দ্বন্দ্ব কিন্তু পাকিস্তানের ঔপনিবেশিক শাসন। যা জনগণের পক্ষে ক্রমশ মানা কঠিন হয়ে পড়ছিল। এছাড়াও স্বায়ত্তশাসন প্রশ্ন বা সাম্রাজ্যবাদ না জোটনিরপেক্ষ নীতি এসব বিষয় ধীরে ধীরে জনগণকে স্বাধীনতা যুদ্ধের দিকে ঠেলে দিয়েছিল। যা গতি পেয়েছিল উনসত্তরের আয়ুব বিরোধী গণ সংগ্রামের দৌলতে। যার প্রধান চালিকাশক্তি ছিলেন মওলানা ভাসানী। তিনি আন্দোলনকে গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে

দিয়েছিলেন। কৃষক, শ্রমিকদের মধ্যে স্বাধীনতা স্পৃহা জাগাতে পেরেছিলেন বলেই সত্তরের গণ আন্দোলন জনযুদ্ধের চেহারা নিতে পেরেছিল। মধ্যবিত্ত শ্রেণী ও নব্য উত্থিত বাঙালি বাণিজ্যগোষ্ঠীর নয়নমণি ছিলেন বঙ্গবন্ধু। ভাসানীকে পশ্চিমি দেশগুলোর বিখ্যাত মিডিয়া নাম দিয়েছিল প্রফেট অব ভায়োলেন্স বলে। কিন্তু মওলানার জ্বালাও পোড়াও আন্দোলন কৃষক শ্রমিকদের যতটা উদ্দীপ্ত করেছিল, সন্ত্রস্ত করেছিল পাকিস্তান শাসকদের, পাশাপাশি চিন্তিত করেছিল শহুরে মধ্যবিত্তদের বড় অংশকেও। স্বাধীনতা সব বাঙালিই চাইছিলেন। কিন্তু আর্বান মিডল ক্লাস ও ব্যবসায়ী লবি মোটামুটি ভাবে আইনি পথে স্বায়ত্তশাসন আসার পক্ষে ছিলেন। ভাসানীর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব জনমনে সেভাবে সাড়া ফেলেছে বলে মনে হয় না। আবারও বলছি গ্রামীণ সর্বহারা সচেতন হচ্ছিল। কিন্তু পুরোপুরি প্রস্তুত হতে তখনও ঢের দেরি ছিল।

ভাসানীর সমাজতন্ত্র বনাম আওয়ামী লীগের জাতীয়তাবাদ প্রশ্নে যে জাতীয়তাবাদের পক্ষেই জনতার সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ তা মওলানা ভাসানী বুঝতে পেরেছিলেন। তাই চীনপন্থী রাজনীতিতে সমর্থন থাকলেও ভাসানী শেখ মুজিবুর রহমানকেই উপযুক্ত যোদ্ধা মনে করে সত্তরের নির্বাচনে ন্যাপকে ভোট রাজনীতি থেকে সরিয়ে নেন। বিশিষ্ট সাংবাদিক ও ভাষা আন্দোলনের শহীদদের স্মরণে, 'আমার ভাইএর রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি, আমি কি ভুলিতে পারি' গানটির রচয়িতা আব্দুল গফফর চৌধুরী যথার্থ বলেছেন যে, সত্তরের নির্বাচন বয়কট মওলানা ভাসানীর এক মাষ্টারস্ট্রোক। ন্যাপ নির্বাচনে লড়লে নিশ্চিত বেশ কিছু আসনে জিতত। ফলে যাই বলা হোক না কেন, সেক্ষেত্রে আওয়ামী লীগের পক্ষে একচেটিয়া জয় খানিকটা হলেও মুশকিল ছিল। এটা বুঝতে পেরেই মওলানা তাঁর প্রিয় মুজিবুর রহমানের পথের কাঁটা হতে চাননি। ওই ইলেকশনে বিপুল জয় পাকিস্তানের রাজনীতি বদলে দেয়। তারপর তো বাকি ইতিহাস। সেখানেও অনেক গল্প। অনেক কাহিনি। তাজউদ্দীন আহমদের নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন অস্থায়ী সরকার গড়ে ওঠা। সেই সরকারের প্রতি শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সরকারের অকুণ্ঠ সহযোগিতা এসব তো বলেইছি। তবুও থেকে যায় অজস্র ত্যাগ, তিতিক্ষা, আত্মবলিদানের অকথিত বহু আখ্যান। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের কথা আমরা বলি, কিন্তু কখনও সেভাবে আলাদা আলাদা করে আলোচনায় আসে না খুলনার বাহিরদিয়ার গেরিলা লড়াই, শিবপুরের মজনু মৃধা বাহিনীর মাটি কামড়ে পড়ে থাকা কিংবা টাঙ্গাইলের মরণপণ লড়ে পাকবাহিনীর হাত থেকে সরকারি ভাবে পাক বাহিনীর আত্মসমর্পণের পাঁচ দিন আগে মুক্ত হবার কথা।

মুক্তিযুদ্ধে অনেক সময় এমন ঘটনাও ঘটেছে যা অত্যন্ত দুঃখজনক। অথচ কঠোর বাস্তব। সাধারণভাবে ভারত সরকারের সিদ্ধান্ত ছিল একমাত্র আওয়ামী লীগ নেতা ও সমর্থকদের ট্রেনিং বা অন্যান্য সুযোগ সুবিধা দেওয়া, তারা অন্য এক দেশের মদতে মুক্তিযোদ্ধা। অন্যদিকে দেশের আরও বহু দল, বিশেষ করে বামপন্থীদের অবদান মুক্তিযুদ্ধে কিছু কম নয়। যদিও বামেদের চীনপন্থীদের বিরাট গ্রুপের কাছে এই যুদ্ধ ছিল নিতান্তই দুই কুকুরের কামড়াকামড়ি। কিন্তু পাশাপাশি মওলানা ভাসানীর অনুসারীরা চীনপন্থী হলেও এই যুদ্ধে তাঁরা সক্রিয় ভূমিকাই শুধু নেননি, জায়গায় জায়গায় অসাধারণ সব লড়াই সংগ্রাম করে মুক্তিযুদ্ধের বিজয়ের পথ সহজ করে তুলেছিলেন। শিবপুরে যুদ্ধের ন'মাস দাঁত ফোটাতে পারেনি পাকিস্তানের সামরিক বাহিনী। মান্নান ভূঁইয়া, হায়দার আকবর খান রনো, হায়দার আনোয়ার খান জুনো, রাশেদ খান মেনন, আতিকুর রহমান শালুর লড়াই মুক্তি সংগ্রামের এক গৌরবজ্জ্বল অধ্যায়ের জন্ম দিয়েছিল। অথচ কোথাও সেভাবে তাদের কথা বলা হয় না। শিবপুর যুদ্ধ ঘাঁটিতে প্রধান দায়িত্বে ছিলেন মজনু মিঞা। জুনো ভাই। সেখানে প্রথম শহীদ হন কিশোর ফজলু। কেউ মনেও রাখেননি ফজলুর নাম। দুঃখের কথা, অনেক জায়গায় আওয়ামী লীগের সরকারি মুক্তি বাহিনী অন্যান্য মুক্তিযোদ্ধাদের সহযোগিতা করেনি শুধু নয়, বরং তীব্র বিরোধিতা করেছিল। ভারতের সেনা কমাণ্ডারদের কাছে অন্যের নামে কান ভাঙিয়ে তাদের বিপদে ফেলার ঘটনাও কম নেই। কিছু ক্ষেত্রে

ব্যাতিক্রম অবশ্যই ছিল। টাঙ্গাইলে কাদের সিদ্দিকীর সঙ্গে মিলেমিশে যুদ্ধ করেছেন বামপন্থী গেরিলারাও। কাদের সিদ্দিকী নিজে একইসঙ্গে ছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান ও মওলানা ভাসানীর কাছের লোক। বামেদের নেতা ছিলেন বিশিষ্ট কবি বুলবুল খান মাহবুব। একজন কবি সরাসরি স্টেনগান হাতে যুদ্ধ করছেন এই উদাহরণ পৃথিবীর ইতিহাসে বেশি নেই। টাঙ্গাইলের মুক্তি বাহিনীর নাম ছিল কাদেরিয়া ফোর্স। ভারতের মেজর পিটার যুদ্ধ চলাকালীন পূর্ববঙ্গে ঢুকে ছদ্মবেশে মুক্তি বাহিনীর সেনাদের উৎসাহ দিতেন। একমাত্র মেজর পিটারই ভারতের সেনাবাহিনীর তরফে সরাসরি যুদ্ধে অংশ নেওয়া বাঙালিদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন। এমনকি তিনি বিপদ মাথায় নিয়ে ছদ্মবেশে বিভিন্ন গেরিলা ঘাঁটিতেও গেছেন। বলা বাহুল্য, গেরিলা যুদ্ধের মূল কৃতিত্ব নিঃসন্দেহে বামেদের। তারা দেশের ভেতরে থেকে যুদ্ধ চালিয়ে পাকিস্তানের ফৌজের মনোবল ভেঙে দেওয়াতেই, অত সহজে পাকিস্তানের বিপুল বাহিনী আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হল। জন্ম হল, নতুন এক ভূখণ্ডের। বাংলাদেশের। ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানের নিয়াজি হার মানলেন। তার আগে ১১ই টাঙ্গাইল মুক্ত হল। ভারতের সেনাবাহিনীর কৌশল ছিল যশোর, ঝিনাইদহ হয়ে সোজাসুজি ঢাকা যাবে। কিন্তু তখনও পাকিস্তানের সামরিক বাহিনী মারাত্মক লড়াই চালিয়ে যাচ্ছিল যশোরের পথে পথে। পিটারের কাছে ভারতীয় বাহিনীর নির্দেশ আসে ছত্রিসেনা নামাতে হবে। ফলে নিরাপদ জমি চাই। তখন কাদেরিয়া বাহিনী ভয়ঙ্কর মেজাজে পর্যুদস্ত করে পাক হানাদারদের হঠিয়ে দিতেই ইতিহাসের নতুন এক অধ্যায়ের জন্ম নেওয়ার ছবি স্পষ্ট হয়ে উঠল। জামালপুর টাঙ্গাইলের মাঝামাঝি জায়গার মুক্তাঞ্চলে ছত্রিবাহিনী নামল। তারপর দ্রুত ঢাকার পথে এগোতে লাগল ভারতের সেনা ও মুক্তিবাহিনীর বীর যোদ্ধাদের সমবেত ফৌজ। পিছনে পড়ে থাকল ভয়াবহ ন'টি মাসের লড়াই সংগ্রাম, যন্ত্রণা, হাহাকার, হাজারও শহীদদের রক্ত, মায়েদের লাঞ্ছনার ইতিহাস।

জনযুদ্ধ কখনও কোনও একটি দলের নয়। কোনও ব্যক্তির নয়। এ যুদ্ধের কুশীলব নিশ্চিত অসংখ্য সাধারণ মানুষ। কত কত লোক বিপদ তুচ্ছ করে সেদিন স্বাধীনতা যুদ্ধে এগিয়ে এসেছিলেন তার কোনও হিসেব নেই। সময় মানুষকে নেতা করে। নিশ্চিত মুক্তিযুদ্ধের মহা নায়ক ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। একটি নির্দিষ্ট সময়ে আপামর জনগণ যাবতীয় ভালবাসা, আবেগ নিয়ে তাঁর পিছনে দাঁড়িয়ে স্বপ্ন দেখেছিলেন স্বাধীনতার। তবে কোনও একদিনে এই মহান বিজয় সম্ভব হয়নি। ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপট গড়ে উঠেছিল দীর্ঘদিন ধরে। উনসত্তরের গণ আন্দোলন না হলে বোধহয় ৭১-এই জনতার স্বাধীনতা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়া সহজ হত না। গ্রামে গ্রামে ঘুরে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা জন্ম নিয়েছিল মওলানা ভাসানীর কৃতিত্বে। ১৯৭০-এ ভয়ঙ্কর প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে বিধ্বস্ত পূর্ব বাংলার উপদ্রুত এলাকায় ঘুরতে ঘুরতে দশ লক্ষ লোকের মৃত্যু দেখে ক্ষুব্ধ, ক্রুদ্ধ মওলানা ভাসানী গর্জন করে বলে উঠেছিলেন, ওরা কেউ আসেনি। পাকিস্তানের শাসকদের নির্লিপ্ত ভূমিকায় ভাসানী বলেছিলেন, আজ থেকে পূর্ব বাংলা স্বাধীন। সব মিলিয়ে তাই, আবারও বলব, মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস কখনও একমাত্রিক নয়। অনেক অনেক আখ্যান আজও রয়ে গেছে। যা নিয়ে চর্চা অত্যন্ত জরুরি।

সৌমিত্র দস্তিদার : তথ্যচিত্র নির্মাতা, প্রাবন্ধিক এবং বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত 'দেশকাল' পত্রিকার কলকাতা সংস্করণের সম্পাদক।